Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 250 - 258
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 250 - 258
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ : বন্ধনমুক্তির প্রত্যাশায় সুদূরের প্রতি তীব্র আকুলতা

পবিত্র বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সাগর মহাবিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
Email ID: pabitra9909@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Post Office, Amal, Rabindranath, Allegorical Drama, Mukti, Nature.

Abstract
Rabindranath's contribution to Bengali literature, a world-renowned literary man with versatile talent, is simply unparalleled. He has appeared on the canvas of plays with various issues of human life. Nature, human-mind, joy-pain and many accounts of getting-not-getting may be found in the dialogues of his plays, in the movement of characters and in various expressions. He adopted a completely new attitude to compose plays according to his needs. Instead of making the actual scene the subject of the drama, he wanted to dramatize an idea with the help of metaphor-symbol-mystery, without giving priority to reality in the drama. The topic of discussion of this article is, in the novel style of allegorical drama, Rabindranath's 'Dakghar' drama portrays the intense longing for the unknown and the unknown in the hope of freedom. He felt the immense joy of liberation and the peace of attainment against the background of natural eternal truths. In 'Dakghar', his emancipated mind has repeatedly peeked into the novel uniqueness of art creation. With temporary repose, closeness to nature, and occasional separation from all the entanglements of the world, he became physically much stronger—overcame mental fatigue and the sudden fear of death. As he felt an indomitable desire to get out of the blocked life and breathe a breath of freedom, he seemed to think that only through death would he regain that free life. And based on this, it can be said that the perspective and canvas of the play 'Dakghar' was created from the experience that temporarily overwhelmed the poet.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 250 - 258
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

"বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর-একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ আকৃতি ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে; তাহার সঙ্গে আমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত— তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানা ভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।"[১]

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের অবদান বাংলা সাহিত্যে এককথায় অতুলনীয়। কেবল বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের এক বিস্ময়রূপেও তিনি আবির্ভূত। যে সময়কালে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতিভাকে বিকশিত করেছিলেন— সেই সময়কাল বাংলা সাহিত্যে স্বর্ণযুগ হিসেবে স্বর্ণাক্ষরে আপামর বাঙালীর মনের মণিকোঠায় চির মুদ্রিত হয়ে আছে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি—সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের অনায়াস পরিভ্রমণ পরিলক্ষিত হয়নি। সাহিত্যের বিভিন্ন সৃজন কর্মে তাঁর শিল্পিত ভাবনা শতবরণের ভাবোচ্ছ্বাসিত হয়ে কলাপের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। তিনি কবি সার্বভৌম—তাঁর অলৌকিক সৃজনী প্রতিভার আলোক স্পর্শে সৃষ্টির প্রতিটি বিষয় জ্যোতির্ময়তায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

"উপনিষদের ভাষায় তিনি 'কবির্মনীষী'—জীবনের সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত আশ্চর্য উন্মোচিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে, প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যমাধুর্যে মুগ্ধ কবিচিত্ত প্রকৃতির আত্মার জ্যোতির্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন ও অনন্ত প্রাণচৈতন্যের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন, মানবমনের সীমাহীন ব্যাপ্তি ও অতলস্পর্শী গভীরতার উদ্ভাস তাঁর সৃজনকর্মে প্রকাশ পেয়েছে, বিশ্ববিধানের নিগূঢ় রহস্য ও অনন্ত বিস্ময় ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে।"[২]

তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিরিক কবি বা গীতিকবি। আত্মভাবমূলক গীতিকবিতা বা গান তাঁর প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশস্থল। ব্যক্তিগত ভাব ও অনুভূতির দর্পণে তিনি জীবন ও জগতকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাঁর কবি-মানস একান্তভাবেই স্বতন্ত্রধর্মী— একটা নিবিড় Subjectivity বা মন্ময়তাই সেখানে বিকশিত হয়েছে। বস্তুজগত তাঁর অনুভূতি ও কল্পনার জারকরসে জারিত হয়ে ক্রমশ তাঁর একান্ত মনোজগতের উপাদান হয়ে উঠেছে।

"সাহিত্যিক জীবনের প্রথম হইতেই দেখা যায়, তাঁহার সন্ধানপর দৃষ্টি বস্তুর মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া, বাহ্যরূপের অন্তরাল ভেদ করিয়া ভাব, আদর্শ বা তত্ত্বের একটা বৃহত্তর প্রতিষ্ঠাভূমি কামনা করিয়াছে।"[৩]

বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই 'আত্মভাব-কল্পনা-প্রধান গীতিধর্মী কবি-মানস'[৪] তাঁর প্রায় সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টিকে এক অদৃশ্য সুতোর টানে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে—যার প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করতে পারি তাঁর কাব্যে, গানে, নাটকে। রবীন্দ্রনাট্যে তাই দেখা যায়, তাঁর নাটক গীতিকাব্য থেকে কোনোভাবেই স্বতন্ত্র নয় বরং একাধিক নাটক কেবল কোনো ভাবানুভূতি বা তত্ত্বের বাহনমাত্র। সুসংবদ্ধ আখ্যানভাগ থাকলেও কাব্য এবং নেপথ্যচারী ভাবের ইঙ্গিত সহজেই তাঁর নাটকে অনুমেয়। আসলে কাব্য ও তত্ত্বের যুগলমূর্তিই তাঁর নাটকের জনপ্রিয়তার বিশেষ দিক।

একথা ঠিক, বাংলা সাহিত্যের জগতে রবীন্দ্রনাথ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাই, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে আমরা হয়তো ভুলতে বসেছি তাঁর সাহিত্য জীবনের বিচিত্র ক্যানভাসে প্রতিফলিত কবিতা-গান আর গল্প-কাহিনীর প্রবল প্রবহমানতায়। অথচ মানবজীবনের বহু-বিচিত্র বিষয়াদি নিয়ে তিনি উপস্থিত হয়েছেন নাটকের ক্যানভাসে। প্রকৃতি, মানব-মন, আনন্দ-বেদনা আর পাওয়া-না-পাওয়ার অনেক হিসেব হয়তো মিলবে তাঁর নাটকের সংলাপে, চরিত্রের গতি-অন্বেষায় ও বিচিত্র প্রকাশে। মানুষের মধ্যেকার দীর্ঘলালিত প্রবণতাগুলিকে আলোড়িত করবার জন্য তাঁর প্রতিনিয়ত যে আকুলতা, তার সরল-স্বাভাবিক-প্রত্যাশিত চিন্তনের বিচিত্র ডালি সারিবদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে তাঁর নাটক-বুননের কৌশলে আর সৃষ্ট নাটকীয়তায়। আসলে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে নাট্যসাধনার যে প্রবহমান একটা ধারা ছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াসে যা একটা সমৃদ্ধ শিল্পরূপ পায়, রবীন্দ্রনাথ তাকে যেন আরো পরিপূর্ণ ও বিকশিত করে তোলেন। এদিক থেকে তাঁর

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 250 - 258
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নাট্যবোধ সূক্ষ্ম, সুকুমার ও পরিমার্জিত—তৎকালীন রীতির স্থূলতা ও আতিশয্যকে পরিহার করে তিনি আমাদের এক শোভন সুন্দর শিল্পরূপ উপহার দিয়েছিলেন।

> "প্রথম দিকের নাটকে তিনি ঘাতপ্রতিঘাতময় দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ কাহিনী নির্মাণ করেন, ক্রমে তিনি অন্তর্মুখী হয়ে উঠলেন; তাঁর আঙ্গিকেও এল প্রকাশরূপের সহজ-সারল্য, সংলাপের দ্যুতি, গীতিকবিতার সুষমা।"[৫]

কবিগুরুর প্রতিভা মূলত গীতিকবির প্রতিভা—একথা একবাক্যে আপামর বাঙালি পাঠক স্বীকার করবেন, তা আমরাও নির্দ্বিধায় বলতে পারি। তবে সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও তাঁর প্রতিভা কোনোভাবেই আমরা অস্বীকার করতে পারি না। বাংলা নাটকের বিভিন্ন ধারাতে, বিশেষভাবে গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য, প্রচলিত রীতির পূর্ণাঙ্গ নাটক, কৌতুক নাট্যের পাশাপাশি রূপক-সাংকেতিক নাটক রচনাতে তাঁর নাট্য প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর প্রশংসনীয়। নিজস্ব আবেগ, কল্পনা, স্বপ্ন ও তত্ত্ববাদ তাঁর নাটকগুলিতে যেভাবে ধরা পড়েছে, তাতে আমরা কোনোভাবেই বিস্মিত নই। আর এজন্যই রবীন্দ্রনাটক, কাব্যনাটক কিম্বা রূপক-সাংকেতিক নাটক— সবই কবি প্রত্যয়ের বাহন হয়ে উঠেছে একথা অনস্বীকার্য। আসলে, নাটক রচনার জন্য তিনি আপন প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূর্ণ নতুন একটি ভাবভঙ্গিকে অবলম্বন করে নিয়েছিলেন। বাস্তবে যা দৃশ্য তাকে নাটকের বিষয়বস্তু না করে, বাস্তবতাকে নাটকে প্রাধান্য না দিয়ে তিনি কোনো একটা ভাবকে রূপক-সংকেত-রহস্যের সাহায্যে নাট্যরূপ দিতে চেয়েছিলেন। আর একারণেই রবীন্দ্রনাট্যে দৃশ্যমানতা অপেক্ষা কাব্যলক্ষণই বেশি করে লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথ যে বিচিত্রধর্মী নাটক রচনা করেছেন, তার মধ্যে রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি তাঁর প্রতিভার চূড়ান্ত স্বাক্ষর বহন করে। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণির নাটককে তিনি সামাজিক, রাষ্ট্রিক, মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বকথার বাহনরূপে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কেননা, মানুষের অভ্যন্তর সত্তার এমন অনেক বক্তব্য থাকে যা আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করতে হয়—রূপক ও সাংকেতিক নাটক গুলিতে তিনি সেটাই করতে চেয়েছেন। এখানে রূপক ও সংকেতের সাহায্যে জীবন ও জগতের নানাদিক তুলে ধরা হয়েছে। 'রাজা' নাটকে অরূপের সন্ধান, 'অচলায়তন'-এ প্রথাবদ্ধ ও শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও জীবনের স্থবিরতা থেকে মুক্তির প্রয়াস, 'ডাকঘর'-এ অপরিচিত নিরুদ্দেশে সৌন্দর্যের সন্ধান, 'মুক্তধারা'-য় যন্ত্রসভ্যতার ওপরে মানবচৈতন্যের প্রতিষ্ঠা কিম্বা 'রক্তকরবী'তে সৌন্দর্য ও প্রাণের আহ্বান ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকে রবীন্দ্রনাথ এক নতুন অভিনবত্বের আস্বাদ নিয়ে আসেন। আসলে —

> "পরিচিত জীবনের মধ্যে আর এক অচেনা অজানা জীবন অন্তর্নিহিত থাকে, বস্তুজগতের অতিক্রান্তে অমূর্ত অধ্যাত্ম জগতের আভাস পাওয়া যায়—অনুভূত হয় এক সুদূর অতীন্দ্রিয়লোকের বিস্ময় যা রূপক-সাংকেতিক নাটকে প্রকাশ পায়। রূপক মানেই গভীরতর বোধ, সংকেত মানেই সুদূরপ্রসারী ভাবনার দ্যুতি—বিশ্ববিধানের নিগূঢ় রহস্যময় অনুভূতি তত্ত্বনাটকে ধরা পড়ে। মানুষের পরিচিত প্রত্যক্ষ অতিব্যবহারে জীর্ণ ভাষা দিয়ে বিশ্বের অনন্ত রহস্য অপরিমিত বিস্ময় অলৌকিক রসপূর্ণ ভাবকে ধরা যায় না—সংকেত প্রতীক বা রূপকই পারে সেই অদৃশ্য অধরাকে ব্যক্ত করতে।"[৬]

আলোচ্য এই প্রবন্ধের অগ্রগতিতে আমার আলোচনার বিষয় হল, রূপক-সাংকেতিক নাটকের অভিনবত্বের ধারায় রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকে বন্ধনমুক্তির প্রত্যাশায় অপরিচিত নিরুদ্দেশের প্রতি তীব্র আকুলতার বাঙ্ময় রূপচিত্রণ।

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে একজন স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন এবং শুধু তাই নয়, তাঁর চারপাশের মানুষকেও তিনি স্বাধীনতা ভোগের আনন্দ দিতে পেরেছেন। মুক্তির অপার আনন্দ আর প্রাপ্তির শান্তিকে তিনি অনুভব করতেন স্বাভাবিক শাশ্বত সত্যের পটভূমিকায় রেখে। স্বাভাবিকভাবেই মানসিক ক্লান্তি থেকে সহজ মুক্তির বাসনাকে তিনি আপন উদারতায় গ্রহণ করে নিয়েছেন। 'ডাকঘর'-এ তাঁর সেই মুক্তিপাগল মন বারবার উঁকি দিয়েছে শিল্পসৃষ্টির অভিনব অনন্যতায়। সাময়িক বিশ্রাম, প্রকৃতির সান্নিধ্য আর সংসারের যাবতীয় ঘেরাটোপ থেকে নিজেকে মাঝেমধ্যে আলাদা করে নিয়ে তিনি শারীরিকভাবে অনেকটাই চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলেন—কাটিয়ে উঠেছেন মানসিক ক্লান্তি আর হঠাৎ করে পেয়ে বসা মৃত্যুভয়। অবরুদ্ধ জীবন থেকে বাইরে বের হয়ে মুক্তির নিশ্বাস ফেলবার জন্য তিনি একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে করতে তাঁর যেন কেমন ধারণা হয়েছিল, মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই তিনি সেই মুক্ত জীবনকে ফিরে পাবেন। আর এরই সূত্র ধরে বলা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 250 - 258
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যায়, সাময়িকভাবে মনোগত-দৌর্বল্যজাত যে অনুভূতি কবিকে গ্রাস করে নিয়েছিল, সেই অভিজ্ঞান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে 'ডাকঘর' নাটকের পরিপ্রেক্ষিত ও ক্যানভাস। সমসাময়িক কয়েকটি চিঠিতে এবং বিশেষ করে 'ডাকঘর'-প্রসঙ্গে কবির পরবর্তী কালের বক্তৃতায় কবির এই মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে—

> "আমি দূরদেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার সেখানে কোনো প্রয়োজন নেই, কেবল কিছুদিন থেকে মন বলছে, যে পৃথিবীতে জন্মেছি সেই পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে তবে তার কাছ থেকে বিদায় নেব। ...সমস্ত পৃথিবীর নদী গিরি সমুদ্র এবং লোকালয় আমাকে ডাক দিচ্ছে—আমার চারিদিকের ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে মন উৎসুক হয়ে পড়েছে। আমরা যেখানে দীর্ঘকাল থেকে কাজ করি, সেখানে আমাদের কর্ম ও সংস্কারের আবর্জনা দিনে দিনে জমে উঠে চারিদিকে একটা বেড়া তৈরি করে তোলে। আমরা চিরজীবন আমাদের নিজের সেই বেড়ার মধ্যেই থাকি, জগতের মধ্যে থাকি না। অন্ততঃ মাঝে মাঝে সেই বেড়া ভেঙে বৃহৎ জগৎটাকে দেখে এলে বুঝতে পারি আমাদের জন্মভূমিটি কত বড়—বুঝতে পারি জেলখানাতেই আমাদের জন্ম নয়। তাই আমরা সকলের চেয়ে বড়ো যাত্রার পূর্বে এই ছোটো যাত্রা দিয়ে তার ভূমিকা করতে চাচ্ছি—এখন থেকে একটি একটি করে বেড়ি ভাঙতে হবে তারই আয়োজন।"[৭]

আর একটি পত্রে আছে—

> "নিজের বাইরের আবেষ্টন ভেদ করে আপনার যথার্থ সত্যরূপটিকে লাভ করবার জন্যে ভারি একটা বেদনা বোধ করছি। সেই চিন্তা আমাকে এক মুহূর্ত বিশ্রাম দিচ্ছে না। কেবলি বলছে, বেরও, - না বেরোতে পারলে অন্ধকারের পর অন্ধকার — আপনার প্রকাশ একেবারে আচ্ছন্ন—আমি যেন আর সহ্য করতে পারছিনে, বেরও, বেরও, বেরও — সমস্ত অসত্য থেকে, সমস্ত স্থূলত্ব জড়ত্ব থেকে, বেরও, বেরও — একবার নির্মল মুক্তির মধ্যে প্রাণ ভরে নিশ্বাস গ্রহণ কর — আর নয় —আর দিনের পর দিন এমন ব্যর্থতার মধ্যে কেবলি নষ্ট করে ফেলা নয়—কোথায় ভূমা কোথায় — কোথায় সমুদ্রের হাওয়া, আকাশের আলো, অপরিমিত প্রাণের বিস্তার।"[৮]

'ডাকঘর' (১৯১২) নাটকের পরিসর খুব দীর্ঘ নয়— স্বল্প ও পরিমিত প্রেক্ষাপটে অতি-অপরিহার্য চিন্তা ও আভাসে-ইঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে কাহিনীর অবয়ব ও ফ্রেম। নাটকের ভাববস্তু অত্যন্ত চমৎকার— সুদূরের প্রতি মানবমনের সুতীব্র উৎকণ্ঠা ও পিপাসা তথা মানবাত্মার সঙ্গে বিশ্বাত্মার সম্পর্কের গভীর রসায়ন। বালক অমল ব্যাধিতে শয্যাগত। একটানা আবদ্ধ থাকতে থাকতে সে ঘরের সংকীর্ণ সীমা এবং বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অসীম অনন্তলোকে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। কেননা, বাইরের সীমাহীন সৌন্দর্যের জগৎ তাকে প্রতিনিয়ত ডাকে। শুয়ে শুয়ে সে অসীম লোকের রাজার কথা ভাবে। তার ধারণা রাজা তাকে চিঠি পাঠাবে। তার এই অসম্ভব কল্পনাকে পাকাবুদ্ধির সংকীর্ণ মানুষেরা অবিরত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদিকে ক্রমাগত অমলের রোগ-যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। কল্পনার জাল বুনে সুদূরের পিয়াসী, অসীমের হাতছানিতে এই বালক তবু বিশ্বাস হারায় না। অসীমের সত্যদর্শনে তার মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারপর একদিন রাজার ডাকঘর স্থাপিত হয়—আসলে, এ হল ভগবানের বহিঃপ্রকাশ—এইই বিশ্ব—এইই বিশ্বেশ্বর মহারাজা। অমল এখানে মুমূর্ষু মানবতার প্রতীক। আর ডাকঘর এখানে অসীম ঈশ্বরের প্রতীক। অমল প্রতিনিয়ত আশা করে রাজার প্রেরিত একটি চিঠির। সে চিঠি তাকে সীমার গণ্ডী থেকে দূর-সুদূরে নিয়ে যাওয়ার নিমন্ত্রণ জানাবে—বদ্ধ মানবাত্মা সেখানে মুক্ত মানবাত্মায় পরিত্রাণ পেতে চায়। অমল তাই চেয়েছিল। সে মুক্ত মানবাত্মার প্রতীক হয়ে তাই অসীমের বুকে মিশে গেল।

আসলে, সৃষ্টিপ্রাচুর্যের মধ্যেই প্রতিফলিত রয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যের সৃজনকৌশল এবং ব্যক্তিজীবনের বহুমাত্রিক পর্যায়। রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন—রবীন্দ্রসাহিত্যে অন্তর্নিহিত রহস্যময় আলোকরশ্মি তার সৃষ্টির গভীরতা নির্দেশক। এজন্য আপামর পাঠকসমাজ যেমন তাঁর সাহিত্যে অপরিমেয় রসের সন্ধান পান, ঠিক তেমনি গবেষকরা সন্ধান পেয়েছেন একের পর এক নতুনতর মৌলিক তথ্য। 'ডাকঘর' নাটক সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 250 - 258
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ডাকঘর নাটকের আকারে লিখিত হইলেও ইহাতে নাট্য-ধর্ম বিশেষ কিছু নাই। সুসংবদ্ধ প্লট বা আখ্যানভাগ ইহার নাই; ইহা একটিমাত্র ঘটনার নানা সংলাপ-মুখর বিবৃতি-মাত্র। এই ক্ষুদ্র উপাখ্যানটি যেন একটি গীতিকবিতা—একটিমাত্র ভাবের কেন্দ্র হইতেই ইহার বিকাশ। একটি শান্ত, রুগ্ন, অসহায় বালকের অদম্য কৌতূহল, ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ও তাহার শেষ পরিণাম একটি করুণ-মধুর সুরসৃষ্টি করিয়া সমস্ত কথাবস্তুকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে এবং আমাদের হৃদয়কেও গভীরভাবে স্পর্শ করিতেছে।"[৯]

এই গীতিময় নাট্যবস্তু আমাদের ভাবলোক ও অনুভূতিলোকে যেভাবে অভূতপূর্ব আলোড়ন তুলেছে, তাতে এই কথাটি নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, এই শিল্পরীতি রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো রূপক-সাংকেতিক নাটকে দেখা যায় নি। এর পূর্ববর্তী একাধিক নাটক, যেমন— 'রাজা', 'অচলায়তন' ইত্যাদি নাটকে যেভাবে ঘটনাসংস্থান ও আখ্যানবস্তু পরিবেশনের মাধ্যমে কম-বেশি নাটকীয়তা ও নাট্যবৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি কিন্তু সেদিক থেকে 'ডাকঘর'-এ 'সমস্ত বৈচিত্র্য ও নাটকীয়ত্ব মিলিয়া একটিমাত্র ভাবরসকেই উৎসারিত করিতেছে'[১০]। পাশাপাশি, এই নাটকের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল— এতে কোনো গান আমরা পাই না, অথচ আমরা প্রায়শই লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় নাটকে গান হল একটি শক্তিশালী মাধ্যম। তবে এসব সত্ত্বেও এই নাটকের 'গদ্যলিরিক' আমাদের মনে অপূর্ব ভাবপ্রকাশের মধ্য দিয়ে আমাদের বোধ, অনুভূতি ও কল্পনাকে একইসাথে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে তুলেছে।

'ডাকঘর' নাটকটি যখন লেখা হয়েছিল তখন ছিল কবির খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতালি-গীতিমাল্য পর্ব। স্বাভাবিকভাবেই কবিমানস বিশ্বদেবতার সৃষ্টিসৌন্দর্যের আধ্যাত্মিক লীলায় মগ্ন। অর্থাৎ ভগবদ্ অনুভূতিই ছিল এই সময়ে কবি-মনের মূল প্রেরণা। আর এই অনুভূতিই কবির এই সময়ের কাব্যে, গানে, নাটকে বহুলাংশে আত্মপ্রকাশ করেছে। আলোচ্য 'ডাকঘর' নাটকেও আমরা লক্ষ্য করতে পারি, বিশ্বাত্মার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য মানবমনের প্রবল আকাঙ্ক্ষার স্বতোৎসারিত বহিঃপ্রকাশ—

> "অসীম ও অনন্তের জন্য মানবাত্মার পিপাসা, নির্দেশহীন সুদূরের জন্য উৎকণ্ঠা ও তাহার পরিণাম অপূর্ব সৌন্দর্য ও মাধুর্যে রূপায়িত হইয়াছে 'ডাকঘরে'।"[১১]

নাটকের অমল যেন নাট্যকারের সেই ভগবদ্‌নুভূতিরই লীলা প্রকাশক। কেননা এই অনুভূতিলব্ধ উপভোগের আকর্ষণে ঘরের বাঁধন ছেঁড়ার তীব্র ঐকান্তিকতায় বিশ্বদেবতার ডাক আসতেই তো ডাকঘরের প্রতিষ্ঠা। এই একই অনুভূতি আবার আমরা লক্ষ্য করতে পারি রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পে—গল্পের তারাপদর হৃদয়তন্ত্রেও একই ভাবে ধ্বনিত হয়েছে সুদূরের আহ্বান। তবে উভয়ের মধ্যে একটু পার্থক্যও আছে—তারাপদ যেখানে নিত্যচঞ্চল, বন্ধনভীরু হরিণশিশুর মতো মুক্ত প্রকৃতির আনন্দযজ্ঞে লীলারস আস্বাদন করেছে, সেখানে অমলকে খাঁচায় বন্দী পাখির মতো সুদূরের পানে ডানা মেলে উড়বার স্বপ্ন দেখে যেতে হয়েছে। আসলে শিশুহৃদয় শুদ্ধ, নিষ্পাপ, নির্মল বলেই বিশ্বেশ্বর বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে অমলের জীবনে এমন কল্পনাশক্তি দিয়েছেন যার ভেলায় ভেসে সে অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারে কাঙ্ক্ষিত জগতে। সে প্রতিদিন জানলার পাশে বসে ঐ দূরের পাহাড়ের নীচে ঝরনার জলে ছাতু ভিজিয়ে খাবার স্বপ্ন দেখে। তবে মুক্ত প্রকৃতির সান্নিধ্যে সুখে বিচরণ করার বাধা মনে হয় তার ব্যধি নয়। বরং এই ব্যধি হতে পারে অবিলম্বে তার সেই রহস্যদ্যোতনায় পৌঁছে দেবার একটা মাধ্যম, যেখানে অমলের সদানন্দময় চিত্ত সর্বদা লীলারস আস্বাদন করে চলেছে। আবার অমলের শিশুমনের সারল্যে একে একে তার বন্ধু হয়েছে—নীল আকাশ, পথিক, দইওয়ালা, প্রহরী, ছেলের দল, শশী মালিনীর মেয়ে সুধা সকলেই। একমাত্র মোড়ল ব্যতীত নাটকের আর সকলেই যেন হয়ে উঠেছে অমলপ্রাণ।

অনেকের মতে, কবির ব্যক্তিগত জীবনের সমকালীন একটা বিশেষ অনুভূতি বা ভাবদ্বন্দ্ব এই নাটকের মধ্যে প্রকাশিত —

> "শিলাইদহে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের একটা nervous breakdown হয়েছিল। দিনরাত মরবার কথা এবং মরবার ইচ্ছা তাকে তাড়না করেছে। কিন্তু 'যস্য ছায়ামৃতং তস্য মৃত্যুঃ' (মৃত্যুও যাঁর অমৃতও তাঁরি ছায়া)। এই ঔপনিষদিক উপলব্ধি 'ডাকঘর' নাটকে ছড়িয়ে রয়েছে।"[১২]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 250 - 258
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আসলে বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বরের সাথে সুদূরের পিয়াসী মানবাত্মার একাত্ম হবার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, তা বালক অমলের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। অমল যেন এই মিলনের বাহুডোরে উৎকণ্ঠিত আত্মার প্রতীক। নাটকের শেষেও তাই দেখা যায়, অমল সকল জাগতিক বন্ধনকে ছিন্ন করে বিশ্বরহস্যের অপার মহিমা উপলব্ধির, পরিপূর্ণ রহস্য-সৌন্দর্যের প্রান্তসীমায় পৌঁছানোর সকল বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। অবশ্য একাজে তাকে সাহায্য করেছে কবিপ্রাণ তথা হৃদয়বান মানুষ ঠাকুরদা—

> "ঠাকুরদা মুক্ত পুরুষ, সদানন্দ, সরল অন্তঃকরণবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন। অমলের স্বপ্নকল্পনাকে জাগ্রত করার তিনি সহায়ক।"[১৩]

তিনিই যেন এই নাটকে বালক অমলের সুদূর কল্পচারী মনের অন্দরে বিশ্বসৌন্দর্যের জাল বুনে দিয়েছেন। গল্পের ছলে তার বালক মনকে কাল্পনিক ক্রৌঞ্চদ্বীপের নীল পাহাড়, নদী, সমুদ্র ও পাখিদের জগতে নিয়ে গেছেন— যা রোগগ্রস্ত, ক্ষুদ্র এবং সুদুরের পিয়াসী কৌতূহলী শিশুমনের অফুরন্ত সৌন্দর্যপিপাসা নিবারণ করেছে নিঃসন্দেহে। ধবলের মতো মন, নিষ্পাপ, সহজ, সরল, সাদাসিধা বালক অমল 'বিশ্বের বিচিত্র আনন্দময় প্রকাশের মধ্যে অনির্বচনীয় কৌতূহল ও রহস্যের সন্ধান পায়, ইহাদের সঙ্গে নিজেকে মিলিত করিবার জন্য তাহার নিরন্তর কামনা'[১৪] — তার মন বারবার উড়ে যেতে চেয়েছে দূরে বহুদূরে। চার দেওয়াল ও জানালার আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও মন তার নিরন্তর পড়ে আছে বাইরের সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে। শরীর ও মনের এই বৈপরীত্য আকর্ষণে বালক অমলের অন্তরাত্মা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে প্রতিনিয়ত। তাসত্ত্বেও, রোগগ্রস্ত শরীরে সে নিজের মনোবাসনাকে চরিতার্থ করতে পিসেমশাই ও কবিরাজের শত বারণকে উপেক্ষা করে তার কল্পচারী ভাবুক মনকে সৃষ্টিদেবতার লীলানিকেতনে নিয়ে যায় কল্পনার অনাবিল স্রোতে ভাসিয়ে।

বস্তুত, নাটকটিতে নাট্যকার মূলত তিনটি অনুভবকে পাশাপাশি সাজিয়ে পরিবেশন করেছেন— মৃত্যুর প্রবল বাসনা, অনির্দেশ্য অপরিচিত সুদূরের জন্য প্রবল আগ্রহ আর প্রবাস-যাতনার তীব্র আকুলতা। মূল নাট্যকাহিনীর প্রধান ধারক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র বালক অমল — এই তিনটি অনুভবের মিশেলে নির্মিত এক অসাধারণ সৃষ্টি। তবে শুধু অমল নয়, অমলের পাশাপাশি এই নাটকে ডাকঘর, ডাকহরকরা, বর্ণিত চিঠি, অমলের নিদ্রা, ঘণ্টা — এগুলো সবই যেন এক এক ধরণের প্রতীকী পরিবেশনা। আসলে এইসব সংকেত বা প্রতীক রবীন্দ্রমননের তিনটি ভাবধারার প্রকাশ — ১. বিশ্বের অপার সৌন্দর্যানুভূতি, ২. কবি মনের ব্যক্তিগত নিজস্ব কিছু বাল্যস্মৃতি, ৩. বিশ্বেশ্বর বা মহারাজার সাথে মিলনের অভিপ্রায়। এই সমগ্র বিশ্ব চরাচর সেই অনাদি অনন্ত মহারাজার এক বিশাল ডাকঘর। এই নাটকে বালক অমলের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিস্থাপনে তা তার চোখের সামনেই বসানো হয়েছে। বিশ্বেশ্বর স্বয়ং তাঁর বার্তা সকলের কাছে প্রেরণ করেন এই ডাকঘরের মাধ্যমেই। আর সেই বার্তার বাহক হলেন ডাকহরকরা, যারা বার্তা প্রদানের পাশাপাশি অনন্ত অসীমের সৌন্দর্য ও আনন্দরূপকে সকলের কাছে প্রচার করে বেড়ায়। অমলেরও প্রবল ইচ্ছা সেও একদিন ডাকহরকরা হবে। আবার এখানে রাজার চিঠি মানেই তো বিশ্বেশ্বর মহারাজার ডাক। সে চিঠি সাদা অক্ষরের, কোনো বয়ান থাকে না। সংসারাসক্ত মূঢ় ব্যক্তি সে চিঠির মর্মার্থ বুঝতে পারে না, কোনো লেখাও দেখতে পায় না। ব্যতিক্রম শুধু ঠাকুরদা — তিনি চিঠির অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি এটাও বুঝেছিলেন যে, অমলের সময় এসে গেছে সেই অপার অনন্ত রহস্যালোকে প্রবেশ করে চিরন্তন সৌন্দর্যের অমৃতের স্বাদ ভোগ করার। একই ভাবে, অমলের নিদ্রা, ঘণ্টার ব্যবহার — এ সবই সাংকেতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অর্থময়। অমল বারবার সেই সংকেত ঘণ্টা শোনে আর চির নিদ্রার মধ্য দিয়ে ব্যাকুল হয়ে ওঠে চিরন্তন বিশ্বসৌন্দর্যের মিলনপথে এগিয়ে যেতে। নাটকের শেষে সুধার ফুল নিয়ে আসাও বিশেষ অর্থবহ আঙ্গিকের মধ্যে পড়ে। কেননা ফুল হল প্রেমের প্রতীক। আসলে সেই প্রেমময় বিশ্বেশ্বর যেন তার চিরায়ত প্রেমের মঙ্গলময় দিকটি জগৎবাসীর জন্য বিলিয়ে দিয়ে গেলেন। সুধা ও রাজকবিরাজের অসাধারণ ব্যঞ্জনাময় প্রেমসংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকটির সমাপ্তি আমরা লক্ষ্য করতে পারি—

> "বোলো যে, 'সুধা তোমাকে ভোলে নি'।"[১৫]

নাটকে অমলকে ঘিরে যে মানুষদের বিচরণ তাদেরকে মোটামুটি আমরা তিনটি শ্রেণীতে বিভাজন করতে পারি— এক. অমলকে ঘিরে মানুষদের মধ্যে একদল অমলকে ভালোবাসে না, তাকে অসুস্থতার অজুহাতে আবদ্ধ করে রাখতে চায়

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 250 - 258
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

(যেমন-কবিরাজ ও মোড়ল); দুই. আরেকদল তাকে ভালোবাসে, কিন্তু বাইরের আলো-বাতাসে যেতে দিতে চায় না (মাধব দত্ত, দইওয়ালা, প্রহরী, বালকগণ, সুধা); তিন. আর একটি দল অমলকে ভালোবাসে এবং সকল আবদ্ধতা থেকে খোলা-পরিবেশে তার মুক্তি কামনা করে (ঠাকুরদা, রাজ কবিরাজ)। নাটকের ক্যানভাসে এই সমস্ত মানুষগুলোর ভূমিকা অমলের জীবনে বহুমুখী কর্মধারার মধ্যে দিয়ে চিত্রিত হয়ে উঠেছে — এদের অধিকাংশই অমলের প্রত্যাশা কিম্বা বন্দীজীবন থেকে উন্মুক্ত জীবনের শুভাকাঙ্ক্ষী নয়। তবে এদের মধ্যে ঠাকুরদা আর রাজকবিরাজ দুজনেই অমলের জীবনে বন্দীদশা থেকে মুক্তির জন্য যেন কোনো প্রেরিত অপরিসীম শক্তির আবাহন। ঠাকুরদা তাকে আশ্বস্ত করে—

> "শুনেছি তো তাঁর চিঠি রওনা হয়ে বেরিয়েছে। সে চিঠি এখন পথে আছে।"[১৬]

আবার অন্যদিকে রাজকবিরাজ অমলকে বন্ধনের আগল থেকে মুক্ত করতে বলে ওঠেন—

> "একি! চারিদিকে সমস্তই যে বন্ধ! খুলে দাও, খুলে দাও, যত দ্বার-জানলা আছে সব খুলে দাও।"[১৭]

নাটকটির আদ্যন্ত পাঠ করলে মনে হয় পার্থিব জ্ঞান, মানুষের বাঁচবার প্রাসঙ্গিকতা, বিশ্বের অপার সৌন্দর্য চোখে দেখার আর অনুভব করার আনন্দ — এই সব চিন্তার মালা গ্রথিত হয়েছে অমলের জীবন-অভিজ্ঞানের অনুভব-প্রভায়। আসলে অমলের আছে মুক্তিপাগল মন। তাই সে দইওয়ালা হয়ে দূর গ্রামে দই ফেরি করতে চায়, কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে চায় কোনো এক অজানা গন্তব্যের দিকে, ডাকহরকরার মতো চিঠি বিলিয়ে বেড়াতে চায়, সুধার সাথে সকালের ফুল কুড়াতে চায়, বালকদের সাথে খেলতে তার প্রবল আগ্রহ, এমনকি ঘণ্টাবাদক হয়ে বাজাতে চায় সময়-জানানো ঘণ্টা। বলাবাহুল্য, শাশ্বত পৃথিবীর চিরায়ত এক ছবি যেন রবীন্দ্রনাথ ছোট্ট বালক অমলের কল্পনাজগতে সাজিয়ে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, অমলকেও বোধ হয় তিনি কোনো এক চিরন্তন বিশ্ব-পথিকের আদলে বানিয়েছেন। মুক্তিপাগল অমলের মনে যুক্ত করেছেন অপার আনন্দ। তাই দইওয়ালাকে সে বলেছে—

> "আমাকে তোমার মতো ঐরকম দই বেচতে শিখিয়ে দিয়ো। ঐ রকম বাঁক কাঁধে নিয়ে-ঐরকম খুব দূরের রাস্তা দিয়ে। বুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেচে বেড়াব। কী রকম করে তুমি বল, দই, দই, দই— ভালো দই। আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও।"[১৮]

এটা ঠিক, 'ডাকঘর' নাটকটি রবীন্দ্রনাথের আপন-মৃত্যুভাবনা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। 'ডাকঘর'-এর অমল আসলেই যেন সেই মহাপ্রজ্ঞাবান রবীন্দ্রনাথ — যিনি মৃত্যুচেতনার ওপারে আলো হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন। অমল মৃত্যুকে তুচ্ছ করেছিল বলেই মৃত্যু তাকে ছুঁতে পারেনি। এটা ঠিক, এই জাগতিক পৃথিবীতে জীবনের পূর্ণচ্ছেদ মানেই হল মৃত্যু, প্রায় সকলেই এই ধারণা পোষণ করেন। এই মৃত্যুই হয়তো অমলের হাত ধরেছিল, কিন্তু জীবন-মরণের সীমানা ছাড়িয়ে শাশ্বত, চিরন্তন কোনো বন্ধুই যেন মৃত্যুর সীমার ওপারে অপেক্ষা করেছে অমলের জন্য। স্বাভাবিক ভাবেই জাগতিক মৃত্যু বা জীবনের অন্তিম পূর্ণচ্ছেদ হল এখানে মিথ্যা, সত্য হল সেই বন্ধুর হাত ধরা বা সেই পূর্ণতার বা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকা রাজার হাত ধরা। বলাবাহুল্য, অমল সেই বন্ধুর হাত ধরেই পূর্ণতার পথে যাত্রা শুরু করেছিল। আর এই পথেই শেষ পর্যন্ত মৃত্যুচেতনা বা মৃত্যুভয়কে জয় করে জীবন পথের দুধারের রঙ আর আলোকে পাথেয় করে জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে অমল পৌঁছে গিয়েছিল।

অমল বরাবরই বিশ্বলোকে মুক্তির স্বাদ খুঁজে পেতে চেয়েছিল— 'এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'[১৯]। আর পাঁচজন মানুষের মত এত এত পুঁথি পড়ে তার পণ্ডিত হওয়ার বাসনা একেবারেই ছিল না। দইওয়ালার কাছে সে দই বেচার সুর বা মন্ত্র শিখতে চেয়েছিল। প্রহরীকে সময়ের ঘণ্টা বাজাতে বলেছিল, আবার কোনো সময়ে ক্রৌঞ্চদ্বীপের পাখিদের মতো রঙীন পাখি হতে চেয়েছিল। প্রতিদিনের মতো সুধার কাছে সে সকালের ফুল চেয়েছিল আর অপেক্ষা করেছিল রাজার থেকে প্রত্যাশিত চিঠির জন্য। প্রাত্যহিক সংসারের লেনদেন, ঘরবন্দী জীবনের চার-দেওয়াল তাকে বাঁধতে পারেনি, এমনকি সীমা বা অসীমের সঙ্গে তার সখ্যতাও হয়নি। কিন্তু একথাও ঠিক, প্রতিনিয়ত দৈনিক জীবন প্রবাহের সঙ্গে ছন্দ মেলাতে চাওয়া, বা মিলিয়ে চলতে চাওয়া মানুষ, যতদিন অন্তররূপিণী অমলকে জাগাতে না পারবে, যতদিন ক্ষণিক এবং ক্ষণকালের বেড়াজালকে ভাঙতে না পারবে, ততদিন মৃত্যুচেতনা থেকে মুক্তি নেই। 'ডাকঘর'এর অমল বা 'ডাকঘর'-এর রবীন্দ্রনাথ সেই মৃত্যু চেতনার পরপারে দাঁড়িয়ে থাকা জীবন চেতনার একরাশ মুঠো মুঠো আলো স্বরূপ। আর এই ভাবেই মৃত্যুর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 250 - 258
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চেতনা বা মৃত্যুভয়কে জয় করার উদ্দীপনা মানুষের মধ্যে প্রসারিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে জাগতিক মৃত্যু তুচ্ছ হয়ে যায়। আসলে অমল আমাদের সবার মধ্যে রয়েছে কিন্তু সহজেই আমরা তাকে খুঁজে পাইনা। প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের ভিতরকার সত্যতা না খুঁজে, বাইরের মিথ্যাকে খুঁজে বেড়াই। আর এজন্যই অমলকে জাগাতে পারিনা বলেই মৃত্যুচেতনা আমাদের পিছু ছাড়ে না— আমরা রাজ কবিরাজকে চিনতে পারি না, চিঠির সাদা লেখাগুলো পড়তে পারি না, 'রাজার চিঠি' আর আসে না, প্রহরীর বাজানো 'কালের ঘণ্টা' শুনতে পাই না কিম্বা শশী মালিনীর মেয়ে সুধা আর প্রথম সকালের ফুল নিয়ে ফিরে আসে না।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা এটাই লক্ষ্য করতে পারলাম, কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অনুভূতি অনেকাংশে বালক অমলের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে—

> "Amal is not so much a person of flesh and blood as a personification of the poet's own subjective experience. It is, as it were, a part of universal life-force, and it functions not in the grosser world of matter but in the realm of spirit."[২০]

স্বয়ং কবি বিভিন্ন চিঠি, ব্যক্তিগত আলাপচারিতা কিম্বা অনেক বক্তৃতায় তুলে ধরেছেন। শৈশবে জমিদার বাড়ির ভৃত্যতান্ত্রিক শাসনের চাপে পড়ে কবিও অবাধে বাড়ির বাইরে বার হতে পারতেন না। একস্থানে আবদ্ধ থেকেই মনোজগতের কল্পনায় বিশ্বের নানাস্থানে ভ্রমণ করেছেন। আর এজন্যই তিনি একসময় বিশ্ব সৌন্দর্য্যানুভূতির অভাব বোধ করে দুঃখও অনুভব করেছেন। পরবর্তীকালে মনে হয়, তাঁর শৈশবের সেই অবরুদ্ধ জীবনের আনন্দ-বেদনাময় স্মৃতি ও বিশ্বের অপার রহস্যবোধ কবির অবচেতন মন থেকে বালক অমলের কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অনেকটাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। আসলে 'ডাকঘর' রচনার সমকালে বদ্ধজীবন থেকে বৃহৎ প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে বিচরণ করার সেই তীব্র ব্যাকুলতাই যেন এই নাটকের ক্যানভাসে অমলের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে—

> "অমল বন্দী মানবাত্মা। তাহার মধ্যে মানবাত্মার বন্ধন-বেদনা—দূরের যাত্রায় নিষ্ক্রমণের আকৃতি— yearning of the soul for the infinite!"[২১]

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সংসার-বন্ধন ছিন্ন করে নিজেকে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্ত করার যে আকাঙ্ক্ষা এবং মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবনের সার্থকতা লাভের সম্ভাবনার অনুভূতি অনেকটাই প্রতিফলিত হয়েছে অমলের মধ্যে— আর এই মনোভাবই কবিকে 'ডাকঘর' লিখতে সহায়ক হয়েছে একথা বলাই বাহুল্য। তবে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও সমসাময়িকতাকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথের শিল্পরূপ যেভাবে একটা বৃহৎ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার ফলে 'ডাকঘর' নাটকটি নিঃসন্দেহে সর্বকালের, সর্বমানবের ভাব সত্য হয়ে উঠেছে।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা - ৬, প্রকাশ ১৩১৪, পুনর্মুদ্রণ ১৯৫৮ জানুয়ারি, পৃ. ৭

২. মিত্র, ড. দিলীপ কুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিচয়, দিশারী প্রকাশনী, ৫ বি কলেজ রো, কলকাতা– ৯, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৯ (পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮), পৃ. ৩১৩

৩. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা– ৭৩, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৬১ (পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : আষাঢ় ১৪০৫), পৃ. ২৭

৪. তদেব, পৃ. ২৮

৫. ওয়েব পেজ লিঙ্ক:https://freeporasuna.com/rabindranath-tagores-contribution-to-bengali-drama-literature/

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 250 - 258
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. মিত্র, ড. দিলীপ কুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিচয়, দিশারী প্রকাশনী, ৫ বি কলেজ রো, কলকাতা– ৯, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৯ (পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮), পৃ. ৩৩৬

৭. তারিখ ২২শে আশ্বিন, ১৩১৮ (নির্ঝরিণী দেবীকে লিখিত, দেশ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৮)

৮. তারিখ ২৩শে আশ্বিন, ১৩১৮ (হেমলতা দেবীকে লিখিত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৪৫)

৯. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭৩, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৬১ (পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : আষাঢ় ১৪০৫), পৃ. ২৫১

১০. তদেব, পৃ. ২৫১

১১. তদেব, পৃ. ২৫২

১২. মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশঙ্কর, রবীন্দ্র-নাট্য সমীক্ষা রূপক সাংকেতিক, করুণা প্রকাশনী, ২০০২, কলিকাতা, পৃ. ১১২

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক কনক, রবীন্দ্র নাট্য সমীক্ষা, এ. মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা – ১২, প্রথম প্রকাশ : শ্রী পঞ্চমী, ১৯৫০, পৃ. ১১

১৪. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৬১ (পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : আষাঢ় ১৪০৫), পৃ. ২৫৬

১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা ১৭, বৈশাখ ১৩৯৫ (পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪০২), পৃ. ৩৭১

১৬. তদেব, পৃ. ৩৬৬

১৭. তদেব, পৃ. ৩৭০

১৮. তদেব, পৃ. ৩৫৯

১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, পৃ. ৩৩৯

২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক কনক, রবীন্দ্র নাট্য সমীক্ষা, এ. মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা – ১২, প্রথম প্রকাশ : শ্রী পঞ্চমী, ১৯৫০, পৃ. ১১

২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক কনক, রবীন্দ্র নাট্য সমীক্ষা, এ. মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা – ১২, প্রথম প্রকাশ : শ্রী পঞ্চমী, ১৯৫০, পৃ. ১০